৭
বিভিন্ন আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন

নির্মল মিংজ

আদিবাসীরা হচ্ছে, ভারতের আদি বা আদিম জনগোষ্ঠী। তাই প্রত্যেকের উচিত হবে মাতৃভূমির প্রথম বাসিন্দা ও নাগরিক হিসেবে অন্ততপক্ষে তাদের স্বীকার করে নেওয়া। এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। কিন্তু পরে যারা এসেছে তারা ভারতকে একটি শ্রেণী-নিপীড়িত সমাজে ভাসিয়ে দিয়েছে। পরে আসা এ সকল মানুষদের আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত শোষণ-নিপীড়নই হচ্ছে নিজেদের জীবিকা ও অস্তিত্বের জন্য আদিবাসীদের সংগ্রামের মূল কারণ।

কিছু আদিবাসী সংগ্রাম বেশ সুবিদিত, যেমন : অন্ধ্রপ্রদেশের তেলানগানায় (Telangana) কয়াসের (Koyas) নেতৃত্বে রাম্পা (Rampa) বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতার জন্য পশ্চিম মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ভিল (Bhils) আন্দোলন। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ে নিজেদের রাজ্য পুনরুদ্ধারে গন্দদের (Gonds) বিভিন্ন সংগ্রামের কথাও আদিবাসী সংগ্রামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তবে, স্বাধীনতার আগে ও পরে ঝাড়খণ্ড ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পরিচালিত আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন খেতাব অর্জন করেছিল। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয় নিয়ে একটি রাজ্যের জন্য আদিম জনগোষ্ঠীর আন্দোলনগুলো ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আর অবশেষে তাদের লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছিল। আর একটি পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন স্বাধীনতার আগে শুরু হয়ে চলতে থাকে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর রাজ্যের স্বীকৃতিলাভ পর্যন্ত।

১। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের কিছু সংগ্রামের দৃষ্টান্ত

ভারতে আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে পুরোপুরি আলোচনা করা বা তুলে ধরা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র যে কাজটি সম্ভব, তা হল, আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের অনেক ঘটনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করা এবং এগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝবার জন্য বিশ্লেষণ করা। এটা শুরু করব উত্তর মধ্য ঝাড়খণ্ড অঞ্চল দিয়ে।

আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের ব্যাপারে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। প্রথমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা দরকার :

(ক) ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের কোল বিদ্রোহ (Kole Bidroh)। লার্কা হো'রা (Larka Hos) বিট্রিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল আর অন্যান্য দল তাদের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। উইলকিনসনের আইন বলে এ সকল প্রতিবাদ দমন ও থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই আইন এখন বলবৎ আছে ঝাড়খণ্ডের সিংভুয়াম (Singbhuam) জেলার কোলহান (Kolhan) অঞ্চলে।

(খ) পালামাউয়ে (Palamau) খেরো (Chero) সংগ্রাম ও আন্দোলন। খেরো নেতৃবৃন্দ পালামাউয়ে ব্রিটিশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ক্যামাক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদের দমন করেছিলেন ও থামিয়ে দিয়েছিলেন।

(গ) মানভূমে (Manbhum) ভূমিজ (Bhumij)

বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আদিবাসীদের সর্বপ্রথম আন্দোলন ও সংগ্রামগুলির একটি বিবেচনা করা হয়। সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে ও বন্দুকের নলের মুখে, বিদ্রোহ দমন ক'রে পরিস্থিতি ব্রিটিশ রাজের অধীনে আনা হয়েছিল।

(ঘ) রাজ মহলে (Raj Mahal) পাহাড়িয়া সরদার আন্দোলন (Paharia Sardar Andolan)। এমনকি দিকু (বাইরের উৎপীড়ক) ও ব্রিটিশ বিদেশী ক্ষমতার বিরুদ্ধ সাঁওতালদের লড়াইয়ের আগে, সাউরিয়া (Sauria Paharias) পাহাড়িয়ারা ও মালপাহাড়িয়ারা (Malpaharias) পাহাড়িয়া সরদারদের অধীনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ ধরেছিল। এখন স্বাধীনতার আগে ও পরে আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বিভিন্ন প্রাক-স্বাধীনতা আন্দোলন

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল হূল (Santal Hul)

কথিত আছে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভাইরাও (Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairao) মহাত্মন ঠাকুর বাবার (Thakur Baba) একটি দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারা একটি আহ্বান পেয়েছিলেন আর তা হল, সমতলের বাঙ্গালী মহাজন ও সুদে কারবারীদের হাত থেকে তাদের লোকদের মুক্ত করা। সাঁওতালরা তাদের Abua Desum অর্থাৎ আমাদের দেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা মাঝি ও পরগণাইতি (Majhi and Parganaiti) ব্যবস্থার অধীনে শান্তিতে ও ন্যায্যতায় বসবাস করার জন্য আহূত হয়েছিল। সিধু ও কানু তাদের তীর-ধনুক নিয়ে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে হাজার হাজার সাঁওতাল যোগ দিয়েছিল। তারা ভাগানদিহিতে (Bhagandihi) সমবেত হয়ে পাঁচকাথিয়ার (Panchkathia) মধ্য দিয়ে বারহেত বাজারের (Barhait Bazar) দিকে অগ্রসর হয়েছিল আর মহাজনদের হত্যা করে, গ্রামগুলিতে লুটপাট চালিয়ে দেশটি দখল করে নিয়েছিল।

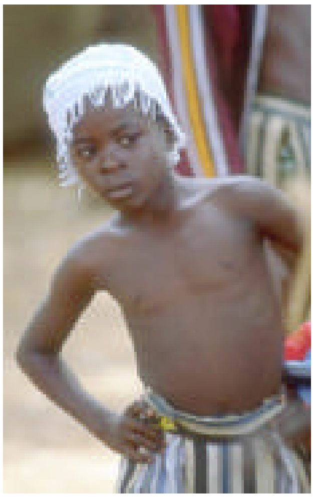

প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়েছিল। কিন্তু দুই বা তিনবার মিলিটারিরা পরাস্ত হওয়ার পর, শক্তিশালী মিলিটারি বাহিনী পাঠিয়ে সিধু, কানু, চাঁদ, ভাইরাওসহ আরও অনেককে আটক করতে সফল হয়েছিল। তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন ক'রে প্রধান প্রধান নেতাদের হত্যা করা এবং অনেককে দীর্ঘদিনের কারাবাস দেওয়া হয়। এইভাবে মিলিটারি বাহিনী সাঁওতাল হূল নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। সাঁওতালদের Damin-i-koh দেওয়া হয়েছিল, তারা সেখানে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বসবাস করেছিল, তাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল মহাজন ও সুদে কারবারীদের হাত থেকে।

মুণ্ডা উলগুলান (১৮৬০-১৯০০) এবং বিরসা আন্দোলন (১৮৯৫) (Munda Ulgulan and Birsa Fndolan)

যেহেতু মুণ্ডারা জমিদার, শাহু এবং সুদে কারবারীদের হাতে নিপীড়িত ও শোষিত হচ্ছিল, তাই তারা অসন্তোষ, অভিযোগে ফুঁসছিল। এছাড়া ছিল মুণ্ডা Desum-এ পুলিশী নৃশংসতা। মুণ্ডা সরদাররা সংগঠিত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এগুলো সহিংস রূপ ধারণ করে। শেষ বিরোধিতার ঘটনা ঘটেছিল যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুসলিম ও পাঞ্জাবি ঠিকাদারদের কাছে কতকগুলো মুণ্ডা গ্রাম লিজ দিয়েছিল। ঠিকাদাররা মুণ্ডা কিশোরী ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পাশাপাশি সোনপুর পরগণা (Sonepur Pargana) অঞ্চলের মুণ্ডাদের প্রতি পীড়নকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ কারণে, মুণ্ডা ও মানকিনরা জোট বেধে ঠিকাদার, জমিদার, সুদের কারবারী এবং অন্যান্য নিপীড়কদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই সংগ্রাম সরদারি লড়াই (Sardari Larai) নামে সুবিদিত, যার অর্থ শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে সরদার যুদ্ধ ও লড়াই।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হওয়া এ আন্দোলন বিরসা মুণ্ডাদের ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দৃশ্যপটে আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিরসা ভাগবন (Bhagwan) মুণ্ডা ও ওঁরাওদের সংগঠিত করেন এবং বিরসার শিষ্যরা মুণ্ডা Desum-এ অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশে মদমুক্ত ও শৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করত। পরিশেষে, বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে খুন্তির (Khunti) পূর্বে অবস্থিত ডুমারি (Dumari) হিলে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বিরাট যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধে হাজার হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারায়। কিছুকাল পর বিরসা মুণ্ডা ও তার অনুসারীদের আটক ক'রে রাঁচী জেল হাজতে পাঠানো হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জেলে বিরসা মুণ্ডার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আন্দোলন দুর্বল হয়ে আসে।

সাঁওতাল হূল ও মুণ্ডা উলগুলান আন্দোলনের ঘটনায়, ব্রিটিশ সরকার কিছু ইতিবাচক পদক্ষে গ্রহণ করেছিল। এ সরকার সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরে আদিবাসী ভূমি রক্ষায় সাঁওতাল পরগণা স্বত্বাধিকার আইন এবং ছোটনাগপুর স্বত্বাধিকার আইন পাশ করেছিল।

ওঁরাও হুহি (Huhi) (১৯১৫-১৯২০)

১৯১৫-১৯২০ এই বছরগুলোতে, বিষুমপুরের (Bisumpur) যাত্রা ওঁরাও (Jatra Oraon) বৈষ্ণব ভক্তিবাদের অনুরাগী (মহাত্মন) ধর্মেশ (Dharmes) কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে লোকদের মাংসাহার ত্যাগ ও সব ধরনের মদ পান পরিহার করে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ ঘটনা ব্রিটিশ সরকারসহ কাউকে খাজনা না প্রদানের রাজনৈতিক দিকে মোড় নেয়, কেননা তাদের পিতৃপুরুষরাই ভূমি প্রস্তুত করে চাষাবাদযোগ্য করে তুলেছিলেন আর এ ভূমি কোন রাজা বা জমিদার তাদেরকে প্রদান করেননি। ধর্মেশই তাদের ভূমি ও দেশ দিয়েছেন, তাই সরকারকে খাজনা পরিশোধ করা কারোরই প্রয়োজন নেই। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এই অঞ্চলের টানা ভাগতদের (Tana Bhagats) কাছ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে ভূমি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেয়, কেননা আন্দোলন মুণ্ডা Desum-এ-ও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে আদিবাসী আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

আদিবাসী মহাসভা (The Adivasi Mahasabha)

শিক্ষিত আদিবাসী খ্রীষ্টানরা তাদের জাতির লোকদের কল্যাণ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিল। তারা শুরু করেছিল উন্নতি সমাজ (Unnati Samaj), যার নেতৃত্বে ছিলেন এ্যাংলিকান গ্র্যাজুয়েট বার্থোলমাই। এছাড়া সারনা (Sarna) আদিবাসীদের মধ্যে ছিল একটি কাথলিক সভা, এবং কিছু ছোটখাট আন্দোলন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তারা সবাই আদিবাসী মহাসভায় নিজেদের একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মারাং গোমকে জয়পাল সিং (Marang Gomke Jaipal Sing) তাদের অবিসম্বাদী নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, সেকালের দিকুদের শোষণ, দমন ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি ও ন্যায়বিচার। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এই আদিবাসী মহাসভা একটি শক্তিশালী আদিবাসী বাহিনী গড়ে তোলে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সংগ্রাম

আগে যেমনটি বলা হয়েছে, বিভিন্ন আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের উৎপত্তি ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক সমাজে। এরপর এগুলো শক্তিশালী আদিবাসী মহাসভায় একীভূত হয়। একটি পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য ঝাড়খণ্ড পার্টির অধীনে আন্দোলন স্বাধীনতার আগে শুরু হয়ে স্বাধীনতা লাভের পরও চলতে থাকে, যার নেতৃত্বে ছিলেন মারাং গোমকে জয়পাল সিংহ।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড পার্টি সংসদীয় নির্বাচনে এবং বিহার ও উড়িষ্যায় রাজ্য নির্বাচানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন জয়পাল সিংহ, ডেভিড মুঞ্জনি এবং ফাদার আন্তনি মূর্মূ। ঝাড়খণ্ড পার্টি বিহারে ৩২টি এ্যাসেমব্লি সিটে আর উড়িষ্যার কয়েকটি সিটে বিজয়ী হয়। এ পার্টি ১৯৫২-১৯৫৭ এই পাঁচ বছরে বিহার এ্যাসেমব্লিতে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছিল। ততক্ষণে শক্রপক্ষ নির্বাচিত আদিবাসী নেতৃবৃন্দের মাঝে বিভক্তি ও শাসনের খেল শুরু করে দিয়েছিল। জয়পাল সিংহসহ তাদের কাউকে কাউকে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখানো হয়েছিল।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে, ঝাড়খণ্ড

পার্টি পায়ের তলার মাটি হারাতে শুরু করে, কেননা এ পার্টি থেকে অনাদিবাসীদের নির্বাচনের টিকিট দেওয়া আর বিভিন্ন রকম হাতছানি মেনে নেয়া হয়। নেতৃবৃন্দ ঘুষ গ্রহণ করে আর জয়পাল সিংহ পরিচালিত দল ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তী তিন বা চারটি সাধারণ নির্বাচনে, ঝাড়খণ্ড পাটি ক্রমশ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই মিশে যাওয়া একটি সম্মিলিত শক্তি হিসেবে আন্দোলনে নেতিবাচক মারাত্মক প্রভাব ফেলে। তবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি অনেক নেতা ও জনসাধারণের হৃদয়-মনে অটুট থাকে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পর, এদের কেউ কেউ ঝাড়খণ্ড পার্টিকে বিভিন্ন নামে সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর এইভাবে কতকগুলো পার্টির জন্ম হয়েছিল :

(১) সাঁওতাল হূল থেকে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে শ্রী জাস্টিন রিচার্ড হূল ঝাড়খণ্ড পার্টি গড়েছিলেন। এ পার্টির বিস্তৃতি ঘটলে, এ.কে রয় এবং বসন্ত বিহারী মাহাতো একে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় রূপদান করেন যার প্রধান নেতা ছিলেন সিবু সরেন। অনুপ্রেরণা ও গতিময়তা লাভ ক'রে এ পার্টি আদিবাসীদের একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়, আর ১৯৭০ এর দশক থেকে একটি পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য দাবির পক্ষে লড়াই করে যায়। এমনকি এটা আজও ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে।

(২) মূল নাম অটুট রেখে এন.ই. হোরো (N.E. Horo) ঝাড়খণ্ড পার্টি সংগঠিত করেছিলেন আর সংসদীয় ও এ্যাসেমব্লি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। একবার, তিনি সংসদে খুন্তি (Khunti) নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি কতকগুলো বিহার এ্যাসেমব্লি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং বিহারের শিক্ষা মন্ত্রীও হয়েছেন। কিন্তু এক সময় এই রাজনৈতিক দলটি আদিবাসী হওয়ার কারণে সংগ্রামের এর জোর বা শক্তি হারিয়ে ফেলে।

(৩) বেশ কতকগুলো সাধারণ নির্বাচনে সর্ব ভারতীয় ঝাড়খণ্ড পার্টিকে নেতৃত্বদানের পর, Chaibasa-এর শ্রী বাগান সুমব্রাই এক এক করে কংগ্রেস, জনতা ও বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় তিনি আদিবাসী সংগ্রামের চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

(৪) ইদানীং ব্যাঙের ছাতার মত বিভিন্ন নামে আদিবাসী আন্দোলন গজিয়ে উঠেছে : ঝাড়খণ্ড বিকাশ দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা পরিত্যাগকারী আর.ডি মুণ্ডা এবং সুরজ মাণ্ডাল; ঝাড়খণ্ড পিপলস্ পার্টি যার নেতৃত্বে ছিলেন সুরজ সিং বেসরা ও অন্যান্যরা; এবং ঝাড়খণ্ড দেশুম (Desum) পার্টি, নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির টিকিটে বিজয়ী সংসদ সদস্য সালখান মূর্মু।

(৫) সালখান মূর্মু ও তার সতীর্থরা আদিবাসী জন-অধিকার মঞ্চ (Adivasi Jana-Adhikari Manch) শুরু করেছিলেন। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর বিজেপীর প্রভাবাধীনে নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে এ দল ক্রমশ পরিচিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আদিবাসী জন-অধিকারী মঞ্চ এবং মূলভাসি (Moolvasi) জন-অধিকারী মঞ্চও একটি নতুন দল ঘোষণা করেছিল, যার নাম ঝাড়খন্ড জন-অধিকারী পার্টি, আর এ পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন বান্দু তির্কি ও অন্যান্যরা।

১৯৫২ থেকে ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের প্রেক্ষাপটে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলায় আদিবাসী সংগঠিত শক্তির অবনতি ও বিভক্তি ধীরে ধীরে ঘটে যায়। সাধারণভাবে ভারতীয় জনগণের জীবনে আর বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবনে দায়িত্বের পাশাপাশি আত্মনিয়ন্ত্রণ যথেষ্টরূপে উন্মেষিত হতে পারেনি। জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় দলগুলো – এবং এই বা ঐ ভাবাদর্শের ছদ্মাবরণে তাদের টাকার খেলা ও পেশীশক্তি – আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করেছে। সাধারণ নির্বাচনে সত্য ও সততা যেমন বেশি প্রাধান্য পায় না, তেমনি পরবর্তীতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ তাদের দায়িত্বও সম্পন্ন করেন না, কথাও রাখেন না। জনসাধারণের কারণ ও ভাবনাগুলোকে সহজেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় আর কায়েমী স্বার্থ রাজনীতিবিদদের প্রধান ভাবনায় পরিণত হয়। নানা ধরনের জালিয়াতি বা প্রতারণা তাদের জনকল্যাণমূলক কাজকে প্রভাবিত ও প্রতিহত করে।

এ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড রাজ্য যে সকল বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, সেগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আদিবাসীদের তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনে আর কতদূর

যেতে হবে ? হ্যাঁ, তাদের নিজেদের রাজ্যে একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে তাদেরকে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে এবং নবায়িত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করে যেতে হবে। 'একটি একতায় মিলিত বিভিন্নতা' – এই দর্শন অবশ্যই সামগ্রিকভাবে ভারতে এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আদিবাসী সমাজগুলোতে গড়ে তুলতে ও বাস্তবায়িত করতে হবে।

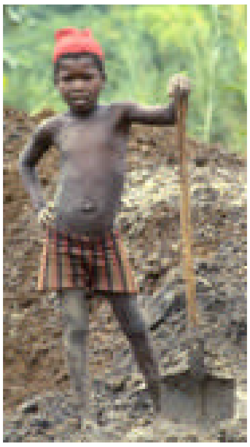

ঝাড়খণ্ড নামধারী রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক ফ্রন্ট গড়ে উঠছে। আদিবাসী সমাজগুলোর বুদ্ধিজীবি ও গভীরভাবে নিবেদিতপ্রাণ সদস্য-সদস্যাদের মাঝে সক্রিয় লবিং একান্ত আবশ্যক, যেন এ সকল ফ্রন্ট তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। স্বাধীন ভারতে তথা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আদিবাসীদের চলমান সংগ্রাম ও আন্দোলনে, এটাই তো হল আজকের কাজ বা দায়িত্ব। এ জন্য প্রয়োজন নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রবাসীদের (provasis/অভিবাসী) বিপক্ষে মূলভাসিদের (Moolvasi/স্থানীয়) নিয়ে জোট গঠন। 'একটি মিলিত বিভিন্নতা'র পতাকাতলে 'একত্ব ও সংহতি অর্জন ব্যতীত, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার এই যুগে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্তিত্বের কোন সুযোগ আদিবাসীদের সামনে নেই।

২। *আদিবাসী সংগ্রামগুলোর অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যা*

স্বাধীনতার আগে ও পরে উভয় সময়কালে বিভিন্ন ব্যক্তি আদিবাসী সংগ্রামকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝেছে ও ব্যাখ্যা করেছে। এই দিকটি নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে।

প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকগণ এবং কিছু ভারতীয় পদস্থ কর্মকর্তাগণকে আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন নিয়ে সরাসরি কাজ-কারবার করতে বা এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। তাদের নিকট আইন-শৃঙ্খলার দাবি ছিল যেন তারা পরিস্থিতি সঠিক জ্ঞানে ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেন। প্রশাসকদের সরাসরি কাজ করতে হয়েছিল মুণ্ডা, ওঁরাও ও সাঁওতালদের নিয়ে। তারা আদিবাসী বিক্ষোভের আশু কারণগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর বুঝতেও পেরেছিলেন মহাজন, জমিদার ও সুদে কারবারীদের হাতে তাদের শোষিত ও নিগৃহীত হওয়া। তবে তারা বুঝতে পারেননি কেন আদিবাসীরা এমনকি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও এত সহিংস। যদিও সাঁওতাল হূলের ন্যায় কিছু ঘটনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে, ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পর্যায়গুলোতে সাঁওতালদের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তারা সাঁওতাল হূলকে মহাজন ও সুদে কারবারীদের অমানবীয় আচরণ, ঋণের বন্দীদশা যা বংশ পরাম্পরায় দাসত্বের পথ সুগম করে, দুর্নীতিবাজ পুলিশ ও আদিবাসীদের সঙ্গে পুলিশের অন্যায় ব্যবহার, এবং সাঁওতালদের দুঃখ-দুর্দশা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার প্রতি আরোপ করেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ বিদেশী বিট্রিশ অফিসারদের চেয়ে অধিকতর ভাল কিছু করতে পারেননি। তারা ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে আইএএস. আইপিএস, আইএফএস হিসেবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন আর আদিবাসী সংগ্রামগুলোকে আইন-শৃঙ্খলার নিছক একটি বিষয় হিসেবে নিয়েছিলেন। তবে এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন ড: ব্রহ্মদেব শর্মা আরও কয়েকজন, আদিবাসীদের সঙ্গে যাদের ভাবনা এক ছিল আর তারা তাদের সমস্যার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যতিক্রমী এ সকল অফিসার বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনে আদিবাসীদের খোদ পরিচয়ই ঝুঁকির মধ্যে।

বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজ বিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাসবিদ ও

অন্যান্যরা যাকে বলা যেতে পারে স্বাধীনতার আগে ও পরে বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি সেই তার প্রতিনিধিত্ব করে। শরৎ চান্দের রয়, এল.পি বিদ্যার্থী, সুরেশ কুমার সিং এবং আরও অনেকে এই দলভুক্ত। এ সকল বুদ্ধিজীবিদের কেউ কেউ তাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষায়তনিক বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে অনেক সহমর্মিতার সাথে আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনগুলোকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন এস.সি. রয়। তার কার্যাবলী, বিশেষ করে 'মুণ্ডারা ও তাদের দেশ' শীর্ষক তার গ্রন্থ, তার এ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছিল যে, মুণ্ডারা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল যখন তারা দেখেছিল তাদের দেশ আবুয়া দেশুম (Abua Desum) দিকুরা অর্থাৎ বহিঃশক্তি এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। তাদেরকে বিতাড়িত করে মুণ্ডা দেশ শত্রুমুক্ত করতে হবে। অন্যান্যরা চেষ্টা করেছিলেন আদিবাসীদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনের, কিন্তু তাদের নানা অবচেতন বদ্ধ ধারণা এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ আদিবাসীদের হেতুর অনুকূলে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খ্রীষ্টান মিশনারীগণের মনোভাব

স্বাধীনতার আগে ও পরে আদিবাসী দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ছিল একটি সহানুভূতিশীল ধারণা, যেমন স্বাধীনতার আগে জার্মান মিশনের আলফ্রেড নটরট, জন ব্যাপ্টিস্ট হপম্যান, রোমান কাথলিক মিশনের কনস্ট্যান্ট লিভেন্স, ও পি.ও. বডিং, জে.ডব্লিউ. কালশ এবং সাঁওতাল মিশনের ওলাফ হোদে এবং স্বাধীনতার পরে রোমান কাথলিক মিশনের ফাদার মিখায়েল ভন ডেন বোগায়ের্ত। মিশনারীগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, তারা আদিবাসী ভূমি সমস্যা, ভাষা ও সংস্কৃতি সাধ্যমত বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে মিশনারীগণের ছিল তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা। স্বাধীনতার আগে ও পরে উভয়কালে, যেহেতু তাদেরকে একটি বিদেশী সরকারের অধীনে কাজ করতে হত, তাই তারা আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনে বিপন্ন রাজনৈতিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। তারা এমনকি আদিবাসী বিক্ষোভের মূল কারণকে শনাক্ত করতে পারলেও, যে পরিস্থিতির মধ্যে তাদের কাজ তা মাথায় রেখে এ ব্যাপারে কিছু করতে পারেননি বা করার সাহসও দেখাননি।

৩। নিজেদের সংগ্রামকে ঘিরে একটি আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গি

ড: আর.ডি. মুণ্ডা এবং সঞ্জয় বসু মল্লিকের সম্পাদনায় (২০০৩) 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলন' শীর্ষক গ্রন্থের 'পরিচয়ের অন্বেষায় আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর সংগ্রাম' উপ-শিরোনামভিত্তিক লেখাটি আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে একটি আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গি যোগায়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে আদিবাসী পরিচয়ের সন্ধানে একটি সংগ্রাম। আদিবাসীদের দাবি হল, আমাদের মাতৃভূমিতে তারাই হচ্ছে আদিম বা প্রথম জনগোষ্ঠী। তারা চেষ্টা করেছে মানব মূল্যবোধগুলো সমুন্নত রাখার, যেমন সমতা, সমাজবোধ, এবং মানুষ, পশুপাখি ও গাছপালার মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সহযোগিতা। তারা জানে কখন গাছ কাটা যাবে ও যাবে না, কখন শিকার করা যাবে ও যাবে না। তাদের জানা আছে ভূমি ও বন, জল ও বাতাস এগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত। কোন যুগের কোন রাজা, সরকার এ সকল প্রাকৃতিক দান তাদের দেয়নি। স্মরণাতীত কাল থেকে যে জমি তারা ভোগ করে আসছে তারাই হচ্ছে তার Khuntkattidar এবং bhuinhar ।

আদিবাসীরা সর্বোপরি মুণ্ডা-মানকিদের অধীনে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ গণতন্ত্র এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধিকারী। তারা সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেশী বেশী নেওয়া ছাড়াই বা বেশী বেশী আয়ের প্রতি কোন রকম লোভ ছাড়াই প্রয়োজন-ভিত্তিক অর্থনীতি অক্ষুণ্ন রেখেছে। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, এ সকল ভাষাকে মিশনারীগণ লিখিত রূপ দান করেছেন। বিশ্বের ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে সাঁওতালী, মুণ্ডারি ও কুরুখ (ওঁরাও) ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, এ সকল ভাষাকে দান করেছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা।

সংগ্রাম নিরন্তর চলতে থাকবে

তাদের ইতিহাস জুড়ে, আদিবাসীরা স্বাধীন জাতি

হিসেবে বসবাস করে এসেছে, আর নিজেদের বিষয়াদি নিজেরাই দেখেছে বা সামলিয়েছে। ভূমি আদিবাসীদের নিকট জীবনস্বরূপ। তাদের মতে, জমি নেই তো জীবনও নেই। অতিমাত্রায় অসম সমাজ ব্যবস্থা, লোভী পরিবেশ, এবং সব ধরনের অসাধুতা ও প্রতারণাময় রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ, যাকে বলা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র, এগুলোর মাঝে জীবনের এরূপ দর্শন এবং হাজার হাজার বছর ধরে এই দর্শনের অভিজ্ঞতা তাদের যুগিয়ে এসেছে তাদের সংস্কৃতি ও ভূমি ধরে রাখার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার মর্যাদা, ইচ্ছা ও সাহস।

এ কারণে ঘটছে আদিম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানব সংস্কৃতি এবং সহিংসতা ও ভারসাম্যহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি বড় সংঘর্ষ, আর এই ভারসাম্যহীন সংস্কৃতি তথাকথিত সভ্য আধুনিক মানুষের তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ থেকেই সৃষ্ট। এখানে উপরে আলোচিত তাদের পরিচয় অন্বেষণ ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে, আদিবাসীদের সংগ্রাম করে যেতে হবে, অব্যাহত রাখতে হবে, মানব মুক্তির লক্ষ্যে তাদের আন্দোলনগুলো। ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নকরণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে সরাসরি প্রভাবিত করছে। আর তাই, আজকের বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক যুগে তাদের ভূমি এবং তাদের মানব ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো অক্ষুণ্ন রাখতে তাদের অবশ্যই সংগ্রাম করে যেতে হবে।

আধুনিক অর্থে ঝাড়খণ্ড রাজ্য আদায়ে সাফল্য আদিবাসীদের কিন্তু খুশি করে না। একজন আদিবাসী পুরুষ বা নারী এমনকি এই নব গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যেই ভূমি, বন, জল ও বাতাস এগুলোর সহজলভ্যতা ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা, কঠিন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে সমতা, সমাজবোধ ও সহযোগিতা বজায় রাখা, এবং আগের মতই পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই কারণে, আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন চলমান থাকতে হবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের জনসংখ্যা (১৯৯১ আদমশুমারী)

	মোট জনসংখ্যা	ভারতীয় জনসংখ্যার %	তফসিলী জাতি	তফসিলী উপজাতি	খ্রীষ্টান
১। আসাম	২২,৪১৪,৩২২	২.৬৫	৭.৪০	১২.৮২	৩.৩২
২। ত্রিপুরা	২,৭৫৭,২০৫	০.৩৩	১৬.৩৬	৩০.৯৫	১.৬৮
৩। মণিপুর	১,৮৩৭,১৪৯	০.২২	২.০২	৩৪.৪১	৩৪.১১
৪। মেঘালয়	১,৭৭৪,৭৭৮	০.২১	০.৫১	৮৫.৫৩	৬৪.৫৮
৫। নাগাল্যাণ্ড	১,২০৯,৫৪৬	০.১৪	-	৮৭.৭০	৮৭.২০
৬। মিজোরাম	৬৮৯,৭৫৬	০.০৮	০.১০	৯৪.৭৫	৮৫.৭৩
৭। অরুণাচল প্রদেশ	৮৬৪,৫৫৮	০.১০	০.৪৭	৬৩.৬৬	১০.২৯
মোট	৩১,৫৪৭,৩১৪	৩.৭৩	-	-	১৩.৬৪

ব্যক্তিগত অনুচিন্তন ও দলীয় সহভাগিতার জন্য প্রশ্নমালা

১। ভারতীয় আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী (অধ্যায় ১)

১.১। তুমি কি একজন উপজাতি/আদিবাসী ? যদি হ্যাঁ, তাহলে একজন আদিবাসী হিসেবে ভারতে বসবাসের তোমার অভিজ্ঞতা কী ? যদি না, তাহলে আদিবাসীদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ও তাদের সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কতটা গভীর ?

১.২। আদিবাসী ও অনাদিবাসীদের সম্পর্কে তোমার ধ্যানধারণা, পছন্দ ও অপছন্দগুলো কি কি ? তোমার জনপদের বর্ণভিত্তিক দলগুলোর থেকে আদিবাসীরা কতটা ভিন্ন ? তুমি কি মনে কর তোমার কোন বদ্ধ-ধারণা তোমার উপলব্ধিগুলোকে রং চড়াচ্ছে ?

১.৩। আদিবাসী পরিচয় ও সংস্কৃতির দিনের পর দিন কিভাবে ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর। তোমার জনপদে কোন্ কোন্ ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো সক্রিয় ? এগুলোর কর্মকৌশলগুলো কী কী ?

১.৪। "'জাতীয় সংহতির' ভাবধারা আদিবাসী অনৈক্যের মাতা।" কথাটা সত্য না মিথ্যা ?

১.৫। শাসক শ্রেণীর আদিবাসী সম্বন্ধে জ্ঞান এবং আদিবাসীদের নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞান এ দু'জ্ঞানের মধ্যে তুলনা কর। আদিবাসী দর্শন কিভাবে শোষণমূলক অনাদিবাসী দর্শনকে সংশোধন করতে পারে ?

২। আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরিচয় (অধ্যায় ২ ও ৩)

২.১। আদিবাসী সংস্কৃতির প্রধান প্রধান দিক/বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? এই সংস্কৃতির কেন্দ্রমূলকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

২.২। আদিবাসী সংস্কৃতি কি অনিবার্যভাবে কোন একটি অঞ্চল, ভূমি ও বনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ? এ সংস্কৃতি কি শহর/শিল্প এলাকায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, খাপ খাওয়াতে ও বিকশিত হতে সক্ষম ? কেন হ্যাঁ বা কেন নয় ? যদি তাই, তবে কিভাবে ?

২.৩। আদিবাসী মূল্যবোধগুলো আদিবাসী, ভারতীয় সমাজ, মণ্ডলী ও হিন্দুধর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন ? আজকের ভারতে এ মূল্যবোধগুলোর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' কিভাবে সম্ভব ?

২.৪। আদিবাসী সংস্কৃতিগুলো বহুমুখিতার অধিকারী। এ কথার দ্বারা কি বুঝানো হয় ? এর ফলাফলগুলো কি হতে পারে ?

২.৫। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক বিভক্তি রয়েছে বলে মনে হয়। এ বিভক্তির জন্য যে সাংস্কৃতিক দিকগুলো দায়ী সেগুলো কি কি, এবং কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ?

২.৬। আদিবাসীরা কিভাবে অর্থপূর্ণ উপায়ে তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিস্তার ও রূপান্তর ঘটাতে পারে ? অতিমাত্রায় আত্মরক্ষামূলক হওয়া কিভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব এবং কিভাবে ভবিষ্যতের উপর, বিকল্পসমূহের উপর আলোকপাত করা যায় ? এক্ষেত্রে অনাদিবাসীরা কিভাবে অবদান রাখতে পারে ?

৩। আদিবাসী সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম (অধ্যায় ২ এবং ৪)

৩.১। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আদিবাসী ও হিন্দুধর্মের মধ্যে বিনিময়গুলো ফলপ্রসূ নাকি ক্ষতিকর হয়েছে ?

৩.২। আদিবাসীদের জীবনে সংস্কৃত্যায়ন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ববাদের প্রভাবের ব্যাপারে তোমার মত কী ?

৩.৩। ব্যাখ্যা কর আদিবাসীরা কেন হিন্দু নয়। হিন্দুকরণ কিভাবে আদিবাসী পরিচয় ধ্বংস করছে ?

৪। আদিবাসী সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন (অধ্যায় ৩)

৪.১। ঔপনিবেশবাদ ও নয়া-ঔপনিবেশবাদ আদিবাসী সংস্কৃতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে ? আর

আধুনিকায়ন ও শিল্পায়নের ব্যাপারে কী বলা যায় ?

৪.২। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আদিবাসী অঞ্চলগুলো বৈশ্বিক শক্তিগুলোর প্রধান টার্গেট। অধিকাংশ আদিবাসী সমাজ কি এই বিপদের ব্যাপারে অবগত ? এক্ষেত্রে করণীয় কী ?

৪.৩। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? আদিবাসী সংস্কৃতিকে এটা কিভাবে প্রভাবিত করছে ?

৪.৪। ওয়াল্টার ফার্ণান্ডেজের ভোগবাদের সমালোচনা কি প্রাসঙ্গিক ? এ ধরনের আলোকপাত কি আমাদের নিজস্ব ভোগাবাদী মনোভাবে প্রভাব ফেলে ?

৪.৫। আজকের দিনে আদিবাসী সাংস্কৃতিক পুন:জাগরণ বলতে তুমি কি বুঝ ? আদিবাসী সমাজগুলোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ পুন:জাগরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? (দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ২.৬)।

৫। আদিবাসী ও খ্রীষ্টধর্ম (অধ্যায় ২ এবং ৪)

৫.১। কেন অনেক আদিবাসী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে ?

৫.২। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবগুলো কি কি (দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ৮.৪)

৫.৩। আদিবাসী সংস্কৃতির অর্থবহ রূপান্তরে খ্রীষ্টান আদিবাসী (ও মণ্ডলী) কিভাবে অবদান রাখতে পারে ? (দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ২.৬)। অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে খ্রীষ্টান আদিবাসীদের সম্পর্ক কেমন হতে হবে ?

৫.৪। আগামী দিনগুলিতে মণ্ডলী ভারতীয় আদিবাসী ও অন্যান্য জনগণকে যে সেবাগুলো প্রদান করতে পারে সেগুলো কি কি ?(দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ৮.৫-৬)।

৫.৫। ভারতীয় আদিবাসীদের পক্ষ নেওয়া মণ্ডলীর কি উচিত ? আদিবাসীদের পক্ষ নেওয়া বলতে বাস্তবে কি বুঝায় ? (দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ৯.৪)।

৬। আদিবাসী এবং বাম ভাবধারা (অধ্যায় ৪)

৬.১। আদিবাসীদের জীবনে বাম ভাধধারার প্রভাবটি কী – অর্থাৎ এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ ?

৬.২। দেশের বিভিন্ন জায়গার আদিবাসীদের মধ্যে নকশালবাদ ব্যাপকতা লাভ করছে কেন ? এ থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে কি যা আদিবাসীদের উপকারে আসবে ?

৭। আদিবাসী নারীর অবস্থান (অধ্যায় ৫)

৭.১। আদিবাসী ও অনাদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান কিভাবে ভিন্নরূপ ? এ ব্যাপারে আদিবাসী সংস্কৃতিতে তোমার পছন্দ-অপছন্দগুলো কি কি ? আদিবাসী নারীদের আরও ভালমত বুঝতে এই অধ্যায় কি তোমাকে সাহায্য করেছে ?

৭.২। আধুনিকায়ন ও বিশ্বায়ন কিভাবে আদিবাসী নারীর পদমর্যাদা বিপন্ন করে তুলছে ? এ সকল বিপজ্জনক ধারা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

৭.৩। ভারতে একটি কম পিতৃশাসিত এবং অনেক বেশী লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আদিবাসী সংস্কৃতি কিভাবে অবদান রাখতে পারে ?

৮। আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন (অধ্যায় ৬)

৮.১। আজকের আদিবাসী পরিস্থিতিকে তুমি কিভাবে মূল্যায়ন করবে ?

৮.২। আদিবাসী উন্নয়নে সরকারি মধ্যস্থতাগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো কি কি ? (দ্র: এখানে প্রশ্ন নং ১.৪ এবং ৪.২)।

৮.৩। বে-সরাকরি প্রতিষ্ঠান ও এ্যাকশন গ্রুপগুলোর মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি ? আদিবাসী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নে এ সকল প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের স্ব স্ব গুরুত্ব কী ?

৮.৪। আদিবাসী উন্নয়নে মণ্ডলীর সম্পৃক্ততার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবটি কি ?

৮.৫। মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গ্রুপকে কি ত্রাণ, দয়া, কল্যাণ ও উন্নয়নমুখী কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ? হ্যাঁ কেন অথবা না কেন ?

৮.৬। "খ্রীষ্টানরা সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের ন্যায় বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে শুধুমাত্র যখন তাদের নিজেদের স্বার্থ বিপদাপন্ন।" এ কথার পক্ষে

বা বিপক্ষে তোমার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। এক্ষেত্রে কী করণীয় ?

৮.৭। আদিবাসী ক্ষমতায়নে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও স্বশাসনের সম্ভাবনা-শক্তিটা কী ? এ ব্যাপারে আদিবাসীদের কী করা উচিত ?

৯। আদিবাসী সংগ্রাম ও আন্দোলন (অধ্যায় ৭)

৯.১। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আদিবাসী অভিবাসনগুলোর গূঢ় অর্থ কী ?

৯.২। আদিবাসীরা কেন ও কিভাবে বাইরের হামলা বা আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল ? বিভিন্ন আদিবাসী সংগ্রাম থেকে আজকের দিনের জন্য যে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলো কি কি ?

৯.৩। তোমার মতে বিভিন্ন আদিবাসী সংগ্রামকে ঘিরে প্রশাসক, বুদ্ধিজীবি ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

৯.৪। আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুমি কি একমত ? কেন হ্যাঁ অথবা কেন না ? বর্তমান সন্ধিক্ষণে আদিবাসী ও অনাদিবাসীদের যে দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর সেটা কী ? সমস্যাদির মূল কারণগুলোকে এবং রাজনৈতিক ইস্যুসমূহকে তারা কিভাবে আয়ত্তে আনতে পারে ?

৯.৫। তোমার জনপদে কি কোন আদিবাসী সংগ্রামের ঘটনা ঘটছে ? তাদের গৃহীত ইস্যু ও কর্ম-পরিকল্পনার ব্যাপারে তোমার মত কী ? তাদের সংগ্রামে আদিবাসী ও অনাদিবাসীরা কিভাবে সামিল হতে বা সমর্থন যোগাতে পারে ?

১০। আদিবাসীরা এবং আগামী দিন

১০.১। ভারতীয় আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তোমার ভাবনা কী ?

১০.২। ভারতের জন্য আদিবাসীদের বহুমুখি অবদানটি কী ? তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ও অবদানের ব্যাপারে তোমার পূর্বাভাষ কী ?

১০.৩। কিভাবে আদিবাসী ও অনাদিবাসীরা একসাথে মিলে একটি সত্যিকার বহুত্ববাদী এবং অনেক বেশী লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও মানবীয় ভারত গড়ে তুলতে পারে ? আর পারে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও 'সমাজতান্ত্রিক' ভারত গড়ে তুলতে ?

১০.৪। এই সহায়িকা থেকে প্রাপ্ত তোমার প্রধান প্রধান উপলব্ধিগুলো কি কি ? তোমার সম্মতি ও অসম্মতিগুলো কি কি ?

স্থানীয় কর্ম-পরিকল্পনা

তোমার দলের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কর, উদাহরণস্বরূপ এ কাজটি প্রশ্নমালার ২.৬, ৮.৭, ৯.৫ এবং ১০.৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে করা যেতে পারে। খ্রীষ্টানদের প্রশ্নমালার ৫.৩, ৪ ও ৫ এবং ৮.৬ নং প্রশ্নগুলোর শরণ নিতে হবে। এই সহায়িকার প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলো পাঠ ক'রে তোমার কর্ম-পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত কর। তোমার জনপদে বাস্তব যেসব বিষয় ও প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলো কি কি ?